এডওয়ার্ড স্নোডেনের আত্মজীবনী: 'পার্মানেন্ট রেকর্ড'

আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী

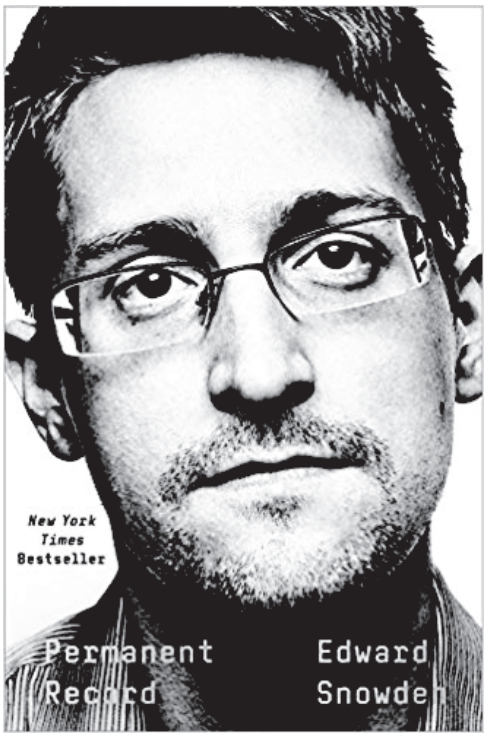

My name is Edward Joseph Snowden. I used to work for the government, but now I work for the public. It took me nearly three decades to recognize that there was a distinction…

স্নোডেন কে বা কী সেই সম্পর্কে আগে থেকে আমার যদি বিন্দুমাত্র ধারণা নাও থাকত, তবু বইয়ের মুখবন্ধের প্রথমেই এ লাইনগুলো সম্ভবত আমাকে বাকি বইটা পড়ে ফেলতে আগ্রহ জোগাত। এই যে সরকারি স্বার্থ ও গণস্বার্থের পার্থক্য বুঝতে পারার প্রশ্ন–এই প্রশ্ন সম্ভবত পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল মানবিক মানুষের মধ্যে এক আত্মীয়তা তৈরি করে। যদিও বইটা হাতে নেয়ার সময় আমার ঠিকই মনে পড়েছিল সেই একরোখা তরুণের কথা, যে মস্কোর এক বিমানবন্দরে টানা ৪০ দিন আটকে পড়ে ছিল পৃথিবীর সবচাইতে পরাক্রমশালী সরকারের কিছু অপকর্মের 'ক্লাসিফাইড' তথ্য ফাঁস করে দেয়ার অপরাধে। নিজ দেশ যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর প্রবেশের সুযোগ ছিল না, আবার পৃথিবীর অন্য কোন দেশ তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার সাহসও সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। অনেকটা টার্মিনাল সিনেমার টম হ্যাংকসের চরিত্রটির মত, কেবল পার্থক্য যে এই ঘটনা আরও অনেক বেশি সিনেমাটিক, আর অনেক বেশি জনগুরুত্বপূর্ণ। ২৯ বছর বয়সের এডওয়ার্ড স্নোডেন, আমাদের সময়ের সবচাইতে আলোচিত হুইসেল বোয়ারদের একজন, যিনি একা যুক্তরাষ্ট্রের 'গণনজরদারির' বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন, যে নজরদারির মধ্যে আছি আমি-আপনিসহ আক্ষরিক অর্থে আমরা সকলে। তাঁর আত্মজীবনী পার্মানেন্ট রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্ক থেকে। সংগত কারণেই এ বই হয়ে উঠেছে আমাদের ডিজিটাল সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

বইটা শুরু হয় ছয় বছর বয়সে স্নোডেনের প্রথম হ্যাকিংয়ের ঘটনা দিয়ে যেখানে তিনি তাঁর জন্মদিনে বাসার সব ঘড়ির সময় ঘণ্টাখানেক পালটে দেন কেবলমাত্র বড়দের মত একটু বেশি সময় জেগে থাকার জন্য; কারণ ছোটদের আগে আগে ঘুমাতে যাবার নিয়ম তাঁর ছিল ভীষণ অপছন্দের। তাঁর প্রথম স্পাইয়িং ছিল নিজের শোবার ঘরের জানালা দিয়ে তাঁর বাবাকে ভিডিও গেম খেলতে দেখা এবং না ঘুমিয়ে সেই খেলার খুঁটিনাটি উপভোগ করা। স্নোডেনের জেনারেশনকে (বলা ভাল আমাদের জেনারেশন) বলা হয় 'মিলেনিয়াল' জেনারেশন, যারা আনডিজিটাইজড পৃথিবীর সর্বশেষ সাক্ষী। একজন মিলেনিয়াল শিশু হিসেবে বাড়িতে প্রথম কম্পিউটার পাওয়া এবং সেই কম্পিউটারকে ধ্যানজ্ঞান বানানো এক স্বাভাবিক ঘটনা। তবে স্নোডেনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল বাড়াবাড়ি পর্যায়ের। স্নোডেনের নিজের ভাষায়, তিনি মূলত বেড়ে উঠেছেন ইন্টারনেটের জগতে। নানা রকম জিনিস জানার ভয়ানক আগ্রহের ফলাফল হিসেবে আমরা দেখতে পাই, হাই স্কুল পড়ুয়া এডওয়ার্ড লস অ্যাঞ্জেলসের নিউক্লিয়ার ল্যাবের সার্ভারের ত্রুটি ধরে ফেলে সেখানকার কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে ই-মেইল পাঠাচ্ছেন। সেই ত্রুটি সারাতে ল্যাব অথরিটির প্রায় এক মাস সময় লেগে যায়। যদিও কিশোর এডওয়ার্ডের বিশ্বাস ছিল, এই ত্রুটি ঠিক করতে এত সময় লাগার কোন মানেই হয় না।

খুব অল্প বয়সে স্নোডেনের এ ধরনের প্রোগ্রামিংয়ের দক্ষতা তাঁর ক্যারিয়ার কোন দিকে যাবে তার একটা ধারণা দিলেও হঠাৎ তাঁর

ছন্দঃপতন হয় ৯/১১-এর পরপর। এত অসংখ্য সাধারণ মানুষের মৃত্যু, অগণিত পরিবারের স্বজন হারানোর শোক যুক্তরাষ্ট্রের আরও অনেক তরুণের মত স্নোডেনকেও মিলিটারি সার্ভিসে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। এবং সম্ভবত, এখান থেকেই শুরু হয় তাঁর পরিণত হয়ে ওঠা। ৯/১১-পরবর্তী ডাবিউ বুশ সময়কালে যুক্তরাষ্ট্র মরিয়া হয়ে ওঠে সারা পৃথিবীতে যে কোন উপায়ে নজরদারি বাড়াতে। এই মিলিটারি ট্রেনিংয়ে থেকেই এই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের অসারতা টের পেতে থাকেন স্নোডেন। শারীরিক আঘাত শেষ পর্যন্ত স্নোডেনকে মিলিটারি সার্ভিসে টিকতে না দিলেও ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটিতে (আইসি) ক্যারিয়ার শুরুর পরপরই রাষ্ট্রীয় বেআইনি নজরদারির ব্যাপারে স্নোডেনের সন্দেহের সূত্রপাত হয়। কিন্তু তখন তিনি নিতান্তই এক থার্ড পার্টি কন্ট্রাক্টের সামান্য কর্মচারী। স্নোডেন এদেরকে বিদ্রুপ করে ডেকেছেন 'হোমো কন্ট্রাক্টাস' বলে। এই নামে আস্ত একটি চ্যাপ্টারই আছে বইয়ে, যেখানে এই কন্ট্রাক্ট প্রক্রিয়া কীভাবে ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির দায়ভার কমায় অথচ পানির মত টাকা ঢালতে কংগ্রেসকে বাধ্য করতে পারে তার একটা রসাত্মক বর্ণনা আছে। দায়িত্ব এড়ানোর প্রমাণও আমরা দেখেছি পরবর্তীতে। স্নোডেন যখন সারা দুনিয়ায় নজরদারির তথ্য ফাঁস করে দেন তখন এনএসএ (ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি) প্রাথমিকভাবে বলার চেষ্টা করে, স্নোডেন নিতান্তই একজন 'কন্ট্রাক্টর' এবং তাঁর ফাঁস করা তথ্য তেমন 'অথরাইজড' নয়।

ক্যারিয়ারের পরবর্তী সাত বছরে সিআইএ এবং এনএসএর কন্ট্রাক্টে পৃথিবীর নানা প্রান্তে, নানা দায়িত্বে স্নোডেনকে কাজ করতে হয় এবং এই পুরো সময়ে নানা বিচ্ছিন্ন সূত্র তাঁকে 'গণনজরদারির' নোংরা বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে থাকে। এই নজরদারির কিছু খুঁটিনাটি প্রথম তাঁর সামনে আসে জেনেভায়। স্নোডেন তাঁর লেখায় নানা সময়ে স্বীকার করেছেন যে 'আইরনি' বরাবরই তাঁকে টানে। এই জেনেভা, যা মেরি শেলির কালজয়ী বই 'ফ্রাংকেনস্টাইন'-এর পটভূমি, সেখানে গিয়ে স্নোডেন যে টেকনিক্যাল টার্মের সাথে তাঁর কাজের সম্পর্ক খুঁজে পান সেটিকে টেকনোলজিস্টরা বলে থাকেন 'ফ্রাংকেনস্টাইন ইফেক্ট'। এই ইফেক্ট হচ্ছে এমন কোন কাজ, যা তার স্রষ্টার ধ্বংসের কারণ হয়। স্নোডেন এই ইফেক্টের সহজ ও ননটেকনিক্যাল উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন– সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মুজাহিদ ও আল-কায়েদার ফান্ডিং ও বিন লাদেনকে গড়ে তোলা। এই জেনেভায় আইসি আক্ষরিক অর্থে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত যোগাযোগের ডাটা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার টেকনোলজি ব্যবহার শুরু করে। আইসির চোখে বিন্দুমাত্র সন্দেহভাজন (এবং সন্দেহভাজন হয়ে ওঠার জন্য কোন ভিত্তির তেমন প্রয়োজন নেই বলাই বাহুল্য) যে কাউকে মনিটর করা ছিল স্নোডেনদের অল্প কিছু কাজের একটি। এই কাজ ছিল ভীষণ ব্যয়বহুল, নিরাপত্তা রক্ষার নামে যার ব্যয়ভার মূলত বহন করতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকেই। এটি সেই সময়, যখন যুক্তরাষ্ট্রের মন্দা পরিস্থিতি শুরু হয়েছে, অথচ স্নোডেন তখন জেনেভাকে অকল্পনীয় বিলাসিতায় ভাসতে দেখেছেন।

গণনজরদারির যে বিষয়টি নিয়ে স্নোডেন বার বার সতর্ক করেছেন তা হল যুক্তরাষ্ট্র কেবল মানুষের যোগাযোগের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করছিল, ব্যাপারটি এত সহজ নয়। আইসি যার রেকর্ড রাখতে শুরু করে তা হল মেটাডাটা। মেটাডাটা তৈরি হয় যে কোন একজন ব্যক্তির কাজের প্যাটার্ন, খাদ্যাভ্যাস, বিনোদনের উপাদান ইত্যাদি সকল কিছুর ওপর ভিত্তি করে। তার মানে, আপনি অনলাইনে (কিংবা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অফলাইনে) কী কিনছেন, কতদিন পর কিনছেন, এই পণ্যের সাথে সম্পূরক বা পরিপূরক কিছু কিনছেন কি না, কিনলে সেটা কবে, কোন পরিমাণে ইত্যাদি ছোট ছোট বিষয় থেকে শুরু করে জীবনের সকল কিছুর উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছিল। তার মানে এই ডাটা ব্যবহার করে একজন মানুষকে আয়নার মত পড়ে ফেলা সম্ভব। তাকে পণ্যে রূপান্তর করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের কিংবা যে কোন সভ্য দেশের আইনেই নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এত বড় ব্যত্যয় মেনে নেয়ার কোন সুযোগ নেই। তার চাইতে আপত্তিকর হল, যেহেতু এই ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে গোপনে, সুতরাং এটিকে গোপনে কাজেও লাগানো সম্ভব। পাঠকরা এই মারাত্মক সত্যের সামনে গিয়ে আমার মত থতমত খাওয়ার পরপরই আবিষ্কার করবেন যে সিআইএ ২০১২ সালে ইতোমধ্যেই আমাজনের সাথে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের ক্লাউড ডেভেলপমেন্ট ও ম্যানেজমেন্টের চুক্তি করেছে!

স্নোডেন নিজের কর্মক্ষেত্রে বার বার বিস্মিত হয়েছেন কেন তাঁর অন্যান্য সহকর্মী এসব ব্যাপার নিয়ে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করে না। এই ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যাটিও গুরুত্বপূর্ণ। স্নোডেনের মতে, প্রতিটি দক্ষ টেকনোলজিস্ট আসলে একেকটি এনক্রিপ্টেড সত্তা হিসেবে কাজ করে এজেন্সিতে। স্পেশালাইজেশনের স্বার্থে প্রত্যেকের কাজের পরিধি এত সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট যে বৃহত্তর পরিসরে চিন্তা করা এই জগতে এক কঠিন কর্ম। সত্যিকারের টেকনিক্যাল এনক্রিপশন নিয়ে যদিও স্নোডেন বরাবরই উচ্ছ্বসিত, কারণ এই এনক্রিপশনই তাঁকে বাঁচিয়েছে নানাভাবে এবং এনক্রিপশনই আমাদের ভবিষ্যতের ভরসা। কিন্তু মানব-এনক্রিপশন নিয়ে তাঁর হতাশা ও দুশ্চিন্তার কথা বইতে বার বার উঠে এসেছে।

তাঁর প্রিয় রুবিকস কিউবের ছকের ভেতর লুকিয়ে রাখা এসডি কার্ডে সমস্ত গোপন দলিল নিয়ে এনএসএ বিল্ডিং (যার অবস্থান ছিল মায়ামির এক আনারসক্ষেতের মাটির নিচে) থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁর কাজ ছিল তাঁর মাকে নিজের বাসায় হঠাৎ দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনা, যাতে ভয়ানক সময়টাতে লিন্ডসে এবং তাঁর মা পরস্পরকে কাছে পান।

২০১২ সালে স্নোডেন ছিলেন তাঁর ক্যারিয়ারের তুঙ্গে। অথচ ১,২০,০০০ ইউএস ডলারের বেতন, মায়ামির নৈসর্গিক বাড়ি, তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী লিন্ডসেও তাঁকে তাঁর বিষণ্নতা ও অপরাধবোধ থেকে বের করে আনতে পারেননি। অবশেষে নিজের সাথে যুদ্ধের এক পর্যায়ে স্নোডেন সিদ্ধান্ত নেয় মানুষের সামনে রাষ্ট্রীয় অপরাধের স্বরূপ ফাঁস করে দেয়ার। বইয়ের এই অংশ বোধ করি পৃথিবীর যে কোন থ্রিলারের চাইতে কম রোমাঞ্চকর নয়। পার্থক্য কেবল–এটি ভীষণ রকম বাস্তব। স্নেডেন জানতেন তাঁর পরিণতি। বিশেষত লিন্ডসের এবং মা-বাবার দুর্ভোগের কথা বার বার ভেবেছেন। সেই কারণে এই জার্নিতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা। শেষ মুহূর্তের আগে কাউকে কিছু বুঝতেও দেননি। তাঁর প্রিয় রুবিকস কিউবের ছকের ভেতর লুকিয়ে রাখা এসডি কার্ডে সমস্ত গোপন দলিল নিয়ে এনএসএ বিল্ডিং (যার অবস্থান ছিল মায়ামির এক আনারসক্ষেতের মাটির নিচে) থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁর কাজ ছিল তাঁর মাকে নিজের বাসায় হঠাৎ দাওয়াত দিয়ে ডেকে আনা, যাতে ভয়ানক সময়টাতে লিন্ডসে এবং তাঁর মা পরস্পরকে কাছে পান। স্নোডেন সেখান থেকে হংকং চলে যান এবং সেখানেই তাঁর সাথে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আরেক চক্ষুশূল ডকুমেন্টারি নির্মাতা লরা

পয়ট্রাস এবং গার্ডিয়ানের সাংবাদিক গেন গ্রিনওয়াল্ড। এই লরা পয়ট্রাসের ডকুমেন্টারি 'সিটিজেন ফোর'-এ পরবর্তীতে সারা পৃথিবীর মানুষ সেই মুহূর্তগুলোর কিছুটা দেখতে পেয়েছে। এই হংকং থেকেই তাঁর দেয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত হতে থাকে রাষ্ট্রীয় 'গণনজরদারির' ওপর রিপোর্ট। মুহূর্তে স্নোডেনের নাম জানতে পারে সারা বিশ্বের মানুষ। বইয়ের শেষ দিকে স্নোডেনের আট বছরের সঙ্গী লিন্ডসে মিলের ডায়রির কিছু অংশ তুলে দেয়া হয়েছে। স্নোডেন তাঁকে অন্ধকারে রেখে চলে যাওয়ার পরবর্তী কিছু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দিন, এরপর হঠাৎ স্নোডেনকে নিয়ে সমস্ত মিডিয়ায় হইচই, ফলস্বরূপ এফবিআইয়ের জেরা কিংবা একজন 'বিশ্বাসঘাতকের' গার্লফ্রেন্ড হিসেবে অনলাইন বুলিংয়ের শিকার হওয়া–সকল কিছুর দলিল রয়েছে সেই ডায়রির পাতায়।

হংকং থেকে মস্কোতে স্নোডেনের যাত্রা বলাই বাহুল্য সহজ ছিল না। স্নোডেনের ইচ্ছা ছিল হংকং থেকে মস্কো, সেখান থেকে হাভানা হয়ে ইকুয়েডরে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়া। কিন্তু রাশান ইন্টেলিজেন্স তাঁকে মস্কোতে আটকে দেয়। তাদের প্রাথমিক প্রস্তাব ছিল রাশান ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করার। স্নোডেন তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁকে জানানো হয় যে আকাশপথে থাকার সময়ই যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাঁর পাসপোর্টকে অকার্যকর ঘোষণা করেছে। ফলে তাঁর কোথাও যাওয়ার আর কোন সুযোগ নেই। ৪০ দিন এয়ারপোর্টে থাকার পর রাশিয়া সরকার অবশেষে তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। স্নোডেন এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য উইকিলিকসের এডিটর সারা হ্যারিসনকে বার বার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। হংকং থেকে মস্কোর সময়কালে যে কয়জন মানুষ অনেকটা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্নোডেনের পাশে দাঁড়িয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন এই সারা।

বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে স্নোডেনকে বুঝতে পারার চেষ্টা আমাদের জন্য একটু কঠিন বটে। যেখানে বিদেশি বড় কোন কূটনীতিক এলে কিংবা বিরোধী দলের বড় কোন কর্মসূচির আগে পাইকারি হারে নিম্ন আয়ের মানুষকে আটক করে জেলে ঢুকিয়ে রাখার একটা সংস্কৃতি মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সামান্য 'গণনজরদারির' মত আপাতচোখে নিরীহ অপরাধের কারণে এক প্রতিশ্রুতিশীল, দক্ষ, বুদ্ধিদীপ্ত তরুণের নিজের জীবন বিপন্ন করাকে আমাদের কাছে 'বোকামি' মনে হবার কথা। কিন্তু স্নোডেনের মত বোকারাই তো পৃথিবীর বদল ঘটায়! ২০১৩-এর পরে সারা পৃথিবীর টেক ইন্ডাস্ট্রিতে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। সারা পৃথিবীর ওয়েবসাইট প্যাটফর্ম http (hypertext transfer protocol) থেকে এনক্রিপ্টেড https (hypertext transfer protocol security)-এ রূপান্তরিত হয়েছে। বড় বড় মিডিয়া হাউজ, যেমন– নিউ ইয়র্ক টাইমস, গার্ডিয়ান–এরা নিজেদের প্যাটফর্ম হিসেবে 'ওপেন হুইস্পার সিস্টেম', 'সিকিউরড্রপ' ইত্যাদি ব্যবহার করছে, যা এনক্রিপ্টেড; ফলে নজরদারির সম্ভাবনামুক্ত। বইয়ের শেষ চ্যাপ্টার 'লাভ অ্যান্ড এক্সাইল'-এ স্নোডেন শেষ পর্যন্ত ওপেন সোর্স, নিরাপদ টেকনোলজির উত্থানের মধ্যেই আশা দেখেছেন, আশা দেখেছেন প্রতিশ্রুতিশীল পেশাদার ও সৎ মানুষদের সদিচ্ছা ও আপসহীনতায়। স্নোডেনের সাথে তাই আশাবাদী হতে পারি আমরা পাঠকরাও।

এনএসএতে কাজ করার সময় একটি ছোট ঘটনা স্নোডেন গুরুত্ব দিয়ে উলেখ করেছেন 'দ্য বয়' চ্যাপ্টারে। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা একজন ইন্দোনেশীয় লোকের ওপর নজর রাখছিলেন। তাঁর ওপর সন্দেহের কারণ ছিল কোন এক সন্দেহের তালিকাভুক্ত ইরানি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের জন্য আবেদন করা। গোপনে সংগ্রহ করা এক ভিডিওতে স্নোডেন দেখতে পান, সেই ইন্দোনেশীয় নাগরিক তাঁর শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে ল্যাপটপে কাজ করছেন। সেই শিশু তার বাবাকে বার বার বিরক্ত করছিল, কিন্তু তিনি শক্ত হাতে শিশুকে ধরে কাজ করে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। হঠাৎ শিশুটি সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকায় এবং স্নোডেনের মনে হয় যে শিশুটি তাঁর চোখের দিকে বিস্ময় নিয়ে ঘুরে তাকিয়েছে। স্নোডেনের মুহূর্তেই তাঁর নিজের বাবার কথা মনে পড়ে এবং এই শুদ্ধ পবিত্র পারিবারিক দৃশ্যে তাঁর অনাহূত নজরদারি যে কতখানি অপরাধের সেই বোধোদয় তাঁকে তাঁর পরবর্তী সিদ্ধান্তের দিকে অনেকখানি এগিয়ে দেয়। 'পার্মানেন্ট রেকর্ড' তাই সব কিছুর ওপর এক মানবিকতার গল্প, যেখানে একজন তরুণ নিজের নাগরিকত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি, নিশ্চিত জীবনের বিনিময়ে রক্ষা করতে চেয়েছে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবন এবং এর গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার।

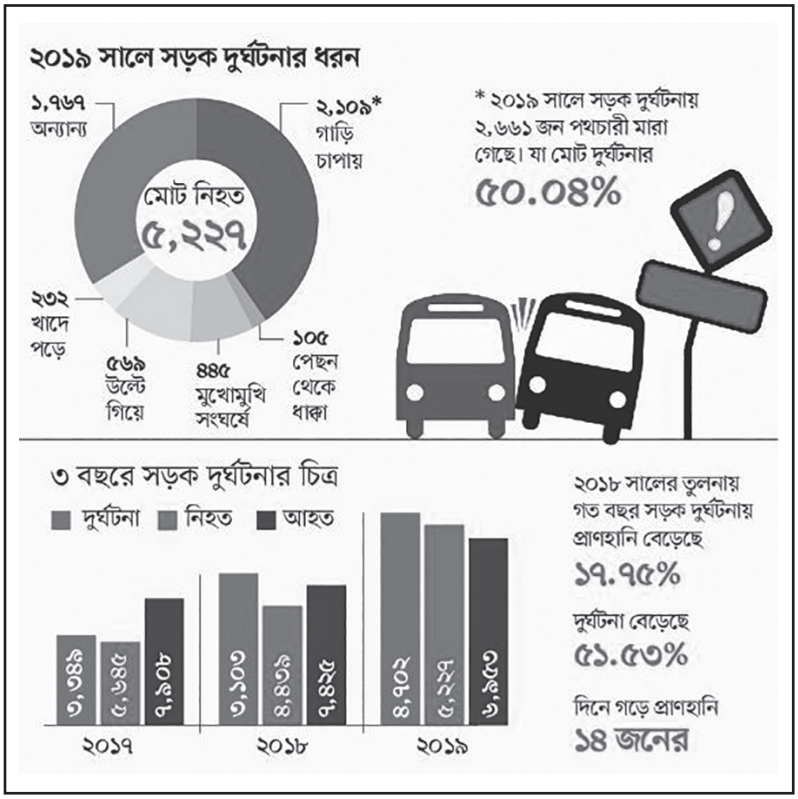

সূত্র: প্রথম আলো, ৫ জানুয়ারি, ২০২০

আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী: লেখক, যুক্তরাষ্ট্রের মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি গবেষক।
ইমেইল: chaity.srsp@gmail.com